প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীপ্রত্যয় বসাক

প্রকাশন-সহযোগিতা :
শ্রীসুধীনকুমার মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীরঞ্জিতকুমার দাস

জি. এ. ই পাবলিশার্স এর পক্ষে আনন্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও বাণী আর্ট প্রেস-এর পক্ষে কালাচাঁদ ঘোষ
কর্তৃক ১১, নরেন সেন স্কোয়ার, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং
গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স-এর পক্ষে গৌরাঙ্গ রায় কর্তৃক
৯৮এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ হইতে গ্রথিত।

রা. স্বা.

আমার জীবন-প্রীতির উৎস ‘শোভা’
এবং
আমার জীবন-প্রতীতির মর্মকেন্দ্র ‘প্রত্যয়’
তোমাদের দু’ জনের হাতেই তুলে দিলাম
আমার বেদনা-মধুর নিমেষ- কুসুমগুলি।

এই লেখকের অন্য বই—

ভারতপথ ও দুই পৃথিবী

ভণিতা

কবিতা লেখা আমার ধাতে নেই, তবে কাব্যি করার রোগটা অধিকাংশ বাঙ্গালির কপালে যেমনটি ঘটে তেমনিভাবেই আমায় ধরেছিল কৈশোরেই। লুকিয়ে লুকিয়ে কড়িকাঠের দশা দেখে 'দুঃখু'-র সঙ্গে ইক্ষু মিলিয়ে ছড়া লিখেছি বহুদিন। অতঃপর লিখেছি পদ্য জাতীয় অনেক কিছু—সে সবই বায়না-দেওয়া ব্যাপার, কারণ বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপককে অনেক দেখনাই-দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে এগুলি কিন্তু কোন বায়নাক্কা সামলাতে নয়, নিজের খেয়ালখুশিতেই লেখা। এগুলি ছড়া নয়, অথচ কাব্য চমৎকারিত্বের আসরে হয়ত ব্রাত্য। অভ্যাসদোষে অথবা আপন খেয়ালখুশিতে যা লিখেছি—তা জলো কবিতা কিংবা কথার ফুলঝুরি কিংবা স্বগতোক্তি যাই হোক—এগুলিতে কিঞ্চিৎ স্মিতরস ও অস্মিতাবোধ আছে মনে হয়। গত এক-দেড় বছরের মধ্যেই এগুলি লিখেছি এবং তাই বুঝি উপসাগরীয় যুদ্ধ, আমাদের রাষ্ট্রীয় অরাজকতা, সন্ত্রাসবাদের নৃশংসতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা তাৎক্ষণিক ঘটনার ছাপ পড়েছে কয়েকটিতে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রতিষ্ঠিত কবি যাঁরা আমাদের মন জয় করেছেন তাঁদের রস-পরিবেশনের আসরের ধারেকাছেও যাইনি এতাবৎ, পাছে আমার কাব্যি রোগটা ধরা পড়ে। কিন্তু ইদানীং একটা ইচ্ছা জেগেছে; ছাই-পাঁশ যা লিখেছি তা ছাপার অক্ষরে দেখতে হয়ত ভাল লাগবে, অতএব ছাপিয়ে দিলাম। এতে আর কিছু না থাক, আমার বেদনাবোধকে ছাপিয়ে উঠেছে এক অস্মিতা-সূচক উদ্ভাসন। চলতি দুনিয়ার রকম-সকম এবং দুরন্ত আবর্তসঙ্কুল দুনিয়াদারির মাঝে আমাদের একাকিত্বের ব্যথা ভুলতে চেয়েছি। তাই আমার এই স্বগতোক্তি। 'কাকতালীয়' নামটি দিয়েছি সে কারণেই।

কাক উড়ে যাবার সঙ্গে তাল পড়ার কার্য-কারণগত সম্বন্ধ নিয়ে নৈয়ায়িকগণ যাই বলুন, ঘটনাটা ঘটতে বাধা নেই।

সেই কবে এক কাক-ডাকা ভোরে 'কাক ডাকে কা কা'—বলেই সুরু করেছিলাম আমার পড়া, তাই বুঝি আজও কোন এ্যান্টিনার উপরে বসে-থাকা একক কাক দেখলে সেই পৌরাণিক চিত্রকল্পটি মনে পড়ে। হয়ত আদিকবি বাল্মীকি-সৃষ্ট ভুষণ্ডীকাক তার বায়সী-ভাষায় আমাদের কিছু বলতে চায়। একদিন ত' সংকল্প

করলাম, আন্তর্জাতিক-পরিবেশ-সংরক্ষণ-দশকের 'ম্যাসকট'-রূপে ওর নামটা ইউ. এন. ও-র দরবারে পেশ করব। হয়ে ওঠেনি সে কাজ। তাই পাঠকের দরবারে পেশ করছি 'কাকতালীয়'। তাঁদের কান ঝালাপালা হলেও আমার কর্ণমর্দনের সুযোগ হয়ত পাবেন না তাঁরা, কারণ পদ্মাপাড় হতে ভায়া কলকাতা আমি অনেকদিন আগেই পালিয়ে এসেছি উশ্রীনদীর ধারে গিরিডিতে। তেমন প্রয়োজনে কাকের মতই উড়ে যেতে পারি 'ক্রিশ্চিয়ান হিলে'র ওপারে কোন ইউক্যালিপটাস গাছের মাথায়।

ঐ যাঃ—যা বলতে চেয়েছিলাম সব তালগোল পাকিয়ে 'হ-য-ব-র-ল' হয়ে গেল। কী কাণ্ড! সেখানেও ত' 'কাকেশ্বর কুচ্‌কুচে'-র অধিষ্ঠান। কি জানি আবার 'দ্রিঘাংচু'—হয়ে আমার ছাতে এসে না বসেন। অতএব, বাঙ্গালি পাঠক, নিজের নিজের কাব্যরোগের কথা মনে রেখে নিজগুণে আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। ইতি—

সূচীপত্র

কলকাতা, তিনশ বছর

অনেক অনেকদিন পরে কলকাতা,
তোমার কলকথায় শুনতে পেলাম
স্থপারনোভার তরঙ্গসংকেত ঃ
প্রচণ্ড গতির কেন্দ্রে ঘূর্ণ্যমান সুস্থিত একক,
সুন্দর সুস্নিগ্ধ দীপ্র জীবনপ্রতীক।
না, না, স্তম্ভিত হয়ো না,
শব্দের ঝঙ্কার শুনে কানে হাত দিয়ে
বলো না, বলো না—
ঐসব হাই-ফাই তত্ত্বকথা বড়ো বাজে,
বড়ো 'মনোটোনাস্'।
তার চেয়ে শাঙ্কর-ভাষ্য কিছুটা সুপাচ্য।
অথবা তোমার ঐ কোপারনিকাস,
কিংবা দ্বান্দ্বিক বস্তুতন্ত্রবাদ অনেকটা প্রাঞ্জল।
তোমার সুস্থিত এক তোমারি থাকুক।

বরং চলো না আজ
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের মখমলমোড়া সিঁড়ি বেয়ে
উঠে যাই কোমল আবাসে, নাম যার 'রজনীগন্ধা'।
আরাম-মাখানো ঐ লাল গালিচায় ধীরে চলো,
ফেনায়িত কফিপাত্রে চুমুকে চুমুকে শুষে নিই—
প্রীতি সাগরের পপ্-গীত অথবা 'জ্যাকসন'-ঝঙ্কার।

কলকাতা, ওগো কস্‌মোপলিটান প্রেয়সী উর্বশী,
অনর্থক প্রলুব্ধ করো না।
তোমার আকাশে আজ নেমেছে কুয়াশা,
তোমার বাতাসে বুঝি ফাগুনের গন্ধমাখা
রক্তকরবীর রেণু,
তোমার ইডেনে আজ ক্রিকেটে ক্লাসিক,
তোমার অঙ্গনে আজ বসেছে আসর—
কলকাতা, তিনশ বছর।

মোহগ্রস্ত মুসাফির আমি,

বারেবারে প্রলুব্ধ করো না, ওগো কলকাতা !

তার চেয়ে বুঝে নিতে দাও তোমার প্রাণন-সত্তা—
বাঙ্গালীর জীবনের মর্মবাণী যাতে
অপরূপ আবেগে উচ্ছ্বাসে স্পন্দিত ঝঙ্কৃত।

পার্কস্ট্রীট মোড়ে দুনিয়ার বিখ্যাত ফকির দাঁড়িয়ে পড়েছে,
বুঝি হতবাক তোমার শতেক কাণ্ড দেখে।
এ কী সেই দুরন্ত যৌবনা কল্লোলিনী কলকাতা,
সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে স্পন্দিত কলকাতা,
অরবিন্দ-রবীন্দ্রের-নেতাজীর
কর্মভূমি-নর্মভূমি তুমি কলকাতা !
শহীদের রক্তে রাঙ্গা রাইটার্স হতে ওরা কারা
দলে দলে ফিরে যায় অকারণ স্লোগানে স্লোগানে
তোমার আকাশ বধির করে ?

হায়, কলকাতা !
আশি লক্ষ মানুষের পদচাপে পিষ্ট কলকাতা,
তোমার গগনচুম্বী বহুতল বিল্ডিং এর প্রতিবেশী
বস্তিবাসী মানুষের
কান্না-ঘাম-রক্তে ভেজা রাজপথে ক্রন্দসী কলকাতা,
তুমি নাকি তিলোত্তমা হবে ?
ডোমিনিক ল্যাপিয়ের তোমারি-ত' নাম দিল—
'সিটি অব জয়।' না না, স্যাটায়ার নয়।
বেদনা-হলুদ-বৃন্তে ফুটে ওঠা রক্তশতদল,
কাব্যে-গানে-শিল্পে-প্রাণে নিত্যনব তরতাজা
তুমি কলকাতা, তোমারে সেলাম—
লাল নয়, কমরেড,
মৃত্যুনীল জীবনের মুক্তির সেলাম।

আগমনী

শরতের শিশিরে আর আকাশের নীলে
আর শিউলির হলুদ-সাদায়
মমতামাখানো এক নস্‌টালজিয়া।
কাকভোরে ছুটে যাই—শিউলি কুড়িয়ে
মুঠি ভরে নিয়ে হাঁটি
পায়ে পায়ে উশ্রীর ধারে ধারে।

ভেজা বালি শিউরে ওঠে, পুবে ফোটে আলোর আভাস
আর আমি শুনি—
আশ্চর্য অশ্রুত এক ঢাকের আওয়াজে
আনন্দময়ীর আগমনী।

কতদিন কত যুগ ধরে কত পথ কেটে কেটে
পদ্মা গঙ্গা দামোদর পার হয়ে এসে
অবশেষে উশ্রীতীরে পেঁছে শুনি—
পুজো পুজো গন্ধমাখা সেই আগমনী।

একই ভাবে উল্‌সে ওঠে মন,
শিউলির আকাশের হলুদে ও নীলে
একই রং-এ একই রসে
ফিরে ফিরে নিজেকেই পাই।

'বড়ো বিস্ময় লাগে'!
আমার এই নৈমিত্তিক দীনতার পরতে পরতে
কখন ছেয়েছে—
রাবীন্দ্রিক অরূপ চেতনাময়
ভালোবাসা আর ভালোলাগা,
লেগেছে কখন—জীবনানন্দের রূপসী বাংলার
গন্ধমাখা ছোঁয়া।

আমার রক্তের প্রতিকণিকায় দুলে দুলে গান গায়
মায়ের পরশ আর মাটির হরষ,
আমার সমগ্র চেতনায়
কচিৎ কখনো সাড়া তোলে—
সেই পাগল ঠাকুরের আকুল আকুতি—
মা, মা মাগো !
সহসা কখন শরতের স্বপ্নভোরে
চমকে উঠে ভাবি—
সাধারণ ছা-পোষা মানুষ আমি,
হরিপদ কেরানীর মত স্বপ্ন দেখি কেন।
অথচ এই গিরিডির ক্রিশ্চিয়ান হিলের
পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কর্কশ ক্র্যাসার
চমক লাগায়—'সব ঝুট হ্যায়'।
তবু হায়, নস্‌টালজিয়া।
শিউলির বোঁটায় আর আকাশের নীলে
আর উশ্রীর ছলছল জলের আয়নায়
মাকে দেখি,
উজ্জ্বল আয়তনেত্রা অপার করুণাময়ী
'বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' আবির্ভূতা।
কখনো বা বারোয়ারী প্যাণ্ডেলের
সুসজ্জিতা মৃন্ময়ী প্রতিমা
চিন্ময়ী জননী হয়ে দিয়ে যায়
আশ্চর্য সম্বিৎ—
মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় স্বপ্নের পিপাসা,
মিথ্যা নয় জীবনের পরিক্রমাপথ,
মৃত্যু যদি সর্বাধিক সত্য
তবে জীবন ত' ততোধিক।

মাকড়সা কিংবা শামুক

'টেলিগ্রাফে'র প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা
বিজ্ঞান-কংগ্রেসের একটি গবেষণা-পত্রের শিরোনাম ঃ
'একটিমাত্র মাকড়সা মেরে আনতে পারো
সমূহ বিনাশ মানবজাতির।'

ওদিকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ-সংরক্ষণ-দশকের
আর একটি ছোট্ট সংবাদ আরও বিচিত্র ঃ
অস্ট্রেলিয়ার পার্থ হ'তে গুটিকয় ক্ষুদ্র শামুক চলেছে
লণ্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে
প্রজাতিলুপ্তির সর্বনাশ রোধকল্পে।

আশ্চর্য!
আমি এক ছা-পোষা বাঙালি গিরিডির প্রত্যন্ত কোনায়
মনে মনে জালবুনি—কল্পনার অদৃশ্য তন্তুতে
নির্বিকার ঊর্ণনাভ; নিবিষ্ট প্রতীক্ষার কেন্দ্রে
বসে থাকি অতিক্ষুদ্র পতঙ্গের আশে।

কারফিউ-কবলিত শহরের রুদ্ধশ্বাস বিষাক্ত আবহে
যে কোন মুহূর্তেই হ'তে পারি পেটোর শিকার।
সংবাদপত্রের পাতায় অথবা টি ভি'র পর্দায়
ভেসে উঠবে,—'মাত্র একজন নিহত
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত।'

সার্বভৌম গণতন্ত্র পঁচাশি কোটির এবং তস্য
নগণ্য এক সদস্যের আকস্মিক হত্যা,
আর গৃহকোণে তুচ্ছ এক মাকড়সার
বিলুপ্তির মাঝে তফাৎ কোথায়!

ঊর্ণনাভ-অপঘাতে 'পরিবেশ-সন্তুলন' বিগড়ে যায় যদি,
তবে মস্তুল্য মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ
অবশ্যই বিচলিত করতে পারে ভারকেন্দ্র
সমগ্র রাষ্ট্রের—এ যুক্তি স্বীকার্য বটে!

নিতান্তই পরিহাস বিজল্পিতম্ !
সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে অথবা মাস্তানের বোমবাজিতে
প্রতিদিন ঝরে যায় দশ-বিশ মানুষ মাকড়সার
পিষ্টদেহ সমাজ-অলিন্দ হতে। কে কার খবর রাখে।

তারচেয়ে 'ওয়ান্ডার্ড দিস উইকে'
ম্যাডোনার লাস্যময়ী গীতিকার ক্ষণিক মূর্চ্ছনা
আমাদের বিভ্রম ঘটাক,
কিংবা, হাতের পাঁচ গীতার শ্লোকটি ত' আছেই,
আউড়ে যাও—'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি।

আরও চমৎকার !
ছোট্ট একটি শামুকের মত নিজস্ব খোলায়
মুখ লুকিয়ে অথবা গুটি গুটি এগিয়ে
ক্ষুদে ক্ষুদে কীটপতঙ্গ খেয়ে আমরা যারা
বেঁচে আছি শম্বুক-মানব এখানে, ওখানে, সেখানে,
তাদেরও প্রজাতি-বিনাশের সম্ভাবনা যদি কোনদিন আসে-
তাহলে ? লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ-পারের
কোন সুপারনোভা হ'তে রশ্মিযানে আনা যাবে
দু'চার জোড়া মানব-মানবী
মানুষ-প্রজাতি-সংরক্ষণ-আলোকবর্ষে।

মেজাজ বিগড়ে গেল ত' ? বরং এসো
টিভি'র নব ঘুরিয়ে দেখি
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে উল্লসিত
আনন্দঝরণার অপূর্ব উচ্ছ্বাস।
কিংবা আবৃত্তি করি—
'মা মুয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ
মৃত্যুমবলোপয়।'

আহা ! শান্তি যে আমাদের একান্তই কাম্য !

অপাবৃণু

কাক ভোরে নিবিড় কুয়াসা ঘেরা
রহস্যময়ী আমার পৃথিবী।
ট্রেনের হুইসিল বাজে কেমন উদাসসুরে,
একটি মাত্র যাত্রী ছোটে অটোরিক্সায়—
ইনটারভিউ দিতে হবে বুঝি।

বিংশশতাব্দীর অন্তিমদশকের ভোরে এমনি কুয়াসা।
সন্ধিলগ্ন ইতিহাস কথা কয়,
কুয়েত, ইরাক আর প্যালেস্টাইন
এবং পাঞ্জাব এবং ইত্যাদি
আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্লগ্নে গুনছে বুঝি
'জিরো আওয়ার।'

অথচ, সেই আদিম প্রকৃতি
তেমনি কুয়াসাঘেরা রহস্যময়ী।
ছোট্ট নদী, রিক্ত টিলা, দীর্ঘ বালিয়াড়ি,
ওপারের ছোটগ্রাম, হাঁটাপথ, শূন্যক্ষেত—
সব আজ ঘোমটায় ঢাকা।
বাজে সেই রাবীন্দ্রিক সুর—
'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে।'

কিন্তু হায়, শতবর্ষপরে আমাদের সুর কেটে যায়—
সভ্যতার সংকটের বেসুরো ক্ষেপা তালে।
আমরা যে 'সোফিস্টিকেটেড', কথায় কথায়
'কস্মোপলিটান';

বাক্যে আর কায়মনে বস্তু কিংবা বিষয়ের
ইন্দ্রোচ্ছল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে
স্বেচ্ছায় দ্বীপান্তরবাসী
অসংখ্যকোটি একক সত্তার অদ্ভুত সংঘবদ্ধতা।

কেউ কারো নই, কিন্তু আমরা সবার।
অপূর্ব বিরোধাভাস, অবিমিশ্র এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স!

মাথাতুলে পথ হাঁটি দুরুদুরু বুকে
স্বাতন্ত্র্য-মুখোশ-আঁটা পরতন্ত্র নাগরিক
রক্তকরবীর 'ঙ' কিংবা 'ফ'-লেবেল-সাঁটা
অলক্ষ্য সুতোর টানে নৃত্যপরা কাষ্ঠপুত্তলিকা।
ছক্‌কাটা জীবনের নৈমিত্তিক দীনতায় ভরা
আমরা সব হা হা করে হাসি, আর
'বলিউড্‌'-নায়কের বেশে ব্রেক-ডান্স করি,
অবশ্যই কল্পনায়।

কিন্তু মনে মনে প্রচণ্ড ভয়ের কাঁপুনি
নিরন্তর অনুভব করি, কারণ
যে কোন মুহূর্তেই হারিয়ে যেতে পারি
বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত সমাজের
নিতান্তই নগণ্য এক অল্পপ্রাণ নাগরিক।

তবুও সূর্য ওঠে,
কুয়াসার আচ্ছাদন সরে যায়,
মনে মনে বলি, 'অপাবৃণু'।
হে সূর্য, আমাদের আবরণ উন্মোচন করো,
যাত্রা করি নূতন ঊষায়।

কাউণ্টডাউন

সারা বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে চলছে 'কাউণ্টডাউন'।
রোজ্-কিয়ামতের দিন এসে গেছে
আরব দুনিয়ায়—ইরাকে, ইরানে জর্ডনে
লেবাননে, কুয়েতে।
আর পশ্চিমী রাষ্ট্র এলাকায় 'ডি-ডে'
যে কোন মুহূর্তেই শুরু হতে পারে
অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাত।
যুযুধান দুইপক্ষ মুখোমুখি
বিশশতকীয় তৃতীয় কুরুক্ষেত্রে—
ধর্মক্ষেত্রে নয়, চরম অধর্মক্ষেত্রে ;
এ লড়াই বাঁচার লড়াই নয়—
আত্মহননের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সভ্যমানুষের।
অথচ এই ছোট্ট শহরের পাশ দিয়ে
ক্ষীণধারায় বয়ে চলেছে উশ্রী—
স্রোত নেই, ঊর্মিমুখরতা নেই,
বিস্তীর্ণ বালুশয্যায় রুপোলি রেখায়
জলধারা বহমান এপারের জীবনধারার মতই।
ভাবছি,
আইনস্টাইনের 'রিলেটিভিটি'র তত্ত্ব বুঝি
নস্যাৎ হতে চলেছে—
নকারাত্মক 'নিগেটিভিটি'র দিকে,
সব হাঁ চলেছে দলবেঁধে
অসীম শূন্যের দিকে।
শাঙ্কর দর্শনের 'জগৎ মিথ্যা'-তত্ত্ব
আজ তাই প্রচণ্ডরূপে
সত্য, সত্য, সত্য।

কিমাশ্চর্য্যম্

অবশেষে বহু-আশঙ্কিত 'জিরো-আওয়ার'
এসে গেল।
বাগদাদ-বম্বিং এর ভয়ানক সমাচার
টিভি'র পর্দায়—
সচকিত দুনিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের বিনিদ্র উদ্বেগ
আর ছ'শ কোটি মানুষের মনে
অজানা বিভীষিকার ছায়া।
আমি ঐ বিশ্বজীবনের সাথে
এক অলক্ষ্য নাড়ির টানে বাঁধা ;
তাই বসে ভাবি তৈলহীন সভ্যতার
গতিরুদ্ধ হতে কত আর বাকি।
ইরাক, কুয়েত কিংবা লেবানন হতে
সহস্রযোজন দূরে ভারতের প্রত্যন্তবাসী
আমাদের মনেও লেগেছে কেমন করে
অপ্রত্যক্ষ আতঙ্কের শিহরণ।
উত্তরায়ণের সূর্য বুঝি আজ থমকে দাঁড়াল।
কুয়াসার আস্তরণে ঢাকা ওপারের
ছায়া ছায়া গ্রাম আর উশ্রীর বালুতটে
ঝিকিমিকি আলোর ইশারা।
নিশ্চিন্ত আলসে ঢিমেতালে তেমনি চলেছে
প্রভাতী গাড়ির সারি বিচালি-বোঝাই,
তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।
এপাশে চায়ের দোকানে
মাটির খুরিতে আজ তুলেছে তুফান—
পেরেজ-দ্য-কুইয়ার, বুশ, ইরাকী সাদাম।
তথাপি, টিভি'র পর্দায় চোখ রেখে
অত্যাধুনিক বম্বারের প্রচণ্ড আওয়াজ
শুনতে শুনতে এখনও

আমি তৈলাক্ত রাজনীতির দাবাখেলা
বুঝতে বুঝতে কম্বলমুড়ি দিয়ে
হাই তুলতে পারি।

দুনিয়া জাহান্নমে যাক্—
আমি ত' বেশ আছি।
কিমাশ্চর্য্যম্।

কাকতালীয়

‘কাক ডাকে কা কা, আগে অ পরে আ।’
হুশ করে একটা কাক উড়ে গেল—
পরিবেশদূষণ রোধকল্পে,
আর ছুটির মেজাজে বসে থাকা আমার কানে
ভেসে এল অর্ধশতাব্দীপূর্ব একটি শিশুর
দুলে দুলে পড়ার সুর—
কাক ডাকে কা কা, কারণ আগে অ পরে আ।

বাঃ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার,
তুমি কি সত্যিই যোগী ছিলে ?
নাহলে এমন গভীর তত্ত্বকথাকে
ছড়ায় ছড়িয়ে দিতে পারলে কি করে।
অক্ষর পরব্রহ্মের পরই আমিরূপ জীবসত্তা।
অথবা অক্ষরে অক্ষরে আমি লিখে যাই
যে বারতা—তাতে অহঙ্কারের ঝলক
কিম্বা কাব্যিরোগের উপসর্গ
অথবা নিতান্ত পাগলামির নমুনা
যতই থাকুক, প্রলাপের শাকে
ঢাকা পড়ে না বাস্তবিক মাৎস্যগন্ধা।

একদিন ছিল বহুবর্ষ বহুযুগ আগে
অজগর তেড়ে আসলেও নিশ্চিন্তমনে
আমরা বাঙ্গালি আমটি পেড়ে খেতে পারতাম।
কিন্তু তাৎক্ষণিক দুনিয়ার গতি বিচিত্রতর—
উটের দেশ সাদ্দামের ইরাকে আর
মুখটি তুলে উট চলে না,
চলছে ‘এম ফিফ্‌টি ট্যাঙ্ক’।
ঋষিমশাই পুজোয় বসবেন কি,
থুড়ি, মোল্লারা আর নমাজে বসবেন কি,

মাথার উপর দিয়ে ঘর্ঘর আওয়াজে
উড়ে যাচ্ছে এফ্‌ সিক্সটিন সি ফ্যালকন,

কার্পেট-বম্বিংএর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে
থরহরি কম্পমান আরব-এলাকা
আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।
তৈলহীন জঙ্গম দুনিয়ার সর্বত্রই
চলছে চাক্কা-জামের উদ্যোগ,
হি-হি-করে হাসবার খোকারা আজ কোথায়!

আমরা আর হাসি না,
অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ টেনে যান্ত্রিকভাবে বলি, 'হাই'।
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে স্কুটার, সময় যে নাই
কারো পানে ফিরে চাহিবার।
হায়রে পেট্রোল, তোমার সঞ্চয়
আজ সর্বত্র বিলীন, কোথা পাই
কোথা তোরে পাই?

জীবনের এ প্রহসনের মাঝে তবে একখানা
গান হোক—দরাজ গলায় আর উদাত্তস্বরে—
'দিন ত' গেল সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে'।
কিন্তু গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল
উইংসের ওপাশ হতে—'পর্দা ফেলে দাও'।
আমি তবু বলি, পর্দা তুলে দাও,
খুলে দাও এই যবনিকা,
আনন্দের হারানো কণিকা খুঁজে নিতে দাও
ওগো শতাব্দীশেষের আকাশ।
হাসিখুশির দেশে যদি আর না ফিরতে পারি
সর্বদ্রষ্টা ভুষণ্ডীকাকের মত তাহলে
উড়ে যেতে চাই।
'ওরে বিহঙ্গ মোর বন্ধ করো না পাখা'।

টাইম-ক্যাপসুল

মাঘের কুয়াসা-ভেজা বাতাসে
সজনেফুলের মিষ্টিগন্ধ ছড়িয়ে গেল
ঝিকিমিকি সোনালী আলোয়।
পেয়ারা পাতার আড়ালে দোয়েলের শিস
আর চড়াই-এর কিচিমিচি,
আর ছাতের আলসেয়
বসে থাকা পায়রার বকম্-বকমে
চলতি দুনিয়ার রকম-সকম নিয়ে
কমেন্টারি চলছে।
উপসাগরীয় লড়াই-এর প্রচণ্ড নির্ঘোষে
ওদের কিছু আসে যায় না,
'স্কাড্ মিসাইল' কিংবা 'এ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌টে'র
আওয়াজেও কিছু যায় আসে না।
টাইগ্রিস বা গঙ্গা বা মিসিসিপির ধারা—
পবিত্র অথবা দোষযুক্ত প্রবাহ
ঠিক তেমনি বয়ে চলেছে মোহানার দিকে।
গজদন্তমিনারবাসী দার্শনিক নই,
নিঃসীম নীলিমায় হারিয়ে যাওয়া
রোমান্টিক কবিও নই, তবু
বিপুলা এ পৃথিবীর ছোট্ট এক জনপদপ্রান্তে
বসে আছি—'অন্তরারাম অন্তর্জ্যোতিরেব'।
কয়েক মুহূর্তের তরে ঋণ-পাওয়া প্রজ্ঞালোকে
এন্টি-রোমান্টিক কল্পনায় রোমন্থন করতে
বেশ একটা আত্মপ্রসাদ পাচ্ছি।
প্রজ্ঞাদর্শন নয়, হয়ত স্বপ্নদর্শন।
আজি হতে শতবর্ষপরে
মানুষ-নামধারী স্তন্যপায়ী জীবের জীবাশ্ম নিয়ে
গবেষণা করছ কোন গ্রহান্তরবাসী?

তোমাকে আগাম জানিয়ে রাখি—
আমরা দশসহস্রবর্ষব্যাপী
চর্চা করেছিলাম বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য ;
আমাদের শাঙ্করদর্শন ও গীতাভাষ্য ;
মধ্যাকর্ষণতত্ত্ব অথবা রিলেটিভিটি,
রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট—
সব সব মিথ্যা হয়ে গেল
আমাদের অহঙ্কারে আর মূঢ়তায়।
আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম
কাব্যে গানে শিল্পে প্রাণে,
আমাদের মমতামাখা স্বপ্ননীড়ে
প্রেয়সী ও সন্তানেরে ঘিরে
ছিল আবেগ-নিবিড় ভালোবাসা।

তথাপি—
আমরা সবাই মিলে
ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে প্রমাণ করেছি,
আমরা বেঁচেছিলাম।

আছি বেশ

সজনে ফুল ও আমের মুকুল এখনও হাতছানি দেয়—
কিংশুকে চম্পকে রঙ্গনে রোমান্সে।
শীতের কুয়াসা-ভোর বসন্তের পথ ছেড়ে দেয়
কোকিলের ডাকাডাকি শুনে।

অথচ আমাদের মনে আর
তেমন করে সুর জাগে না,
তেমনি করে গুনগুন করি না—
'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা'।

আমরা আজ মহানগরীর রাজপথে
মানবশৃঙ্খল রচনা করে স্লোগান দিই—
'বাগদাদ বম্বিং, বন্ধ কর, বন্ধ কর,
গণহত্যা চলবে না, চলবে না।'

মনকে আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে
পৃথক পৃথক অনুভূতি থাকে থাকে সাজিয়ে
আমরা আজ বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
তাই বসন্তবিলাপের ধ্বনি শুনি চায়ের কাপ হাতে;
পরক্ষণেই 'রিমোট কন্ট্রোলে' বাগদাদের
বিধ্বস্ত ঝঙ্কারের শবপংক্তি দেখি,
তারপর, সাড়ে নটার লোকালে কেউ বা
অফিসে, কেউ বা কলেজে রাজা-উজীর
বধ করতে করতে ফাইল-ক্লিয়ার করি,
কখনো ক্বচিৎ লেকচার ঝাড়ি কেউ বা।

পরবর্তী কর্মসূচী?
রাতের চিত্রহারে মনটাকে একটু রসিয়ে নিয়ে
পুত্র-কন্যাকে আর একটু উপদেশ দিয়ে
শুয়ে পড়ি পদ্মনাভম্ শরণ করে।
আছি বেশ।

সজনে ফুল কিংবা আমের মুকুল
কাব্যে অথবা রোমান্সে থাকুক না,
সজনের চচ্চড়ি আর আমের চাটনি
যেন অবশ্যই থাকে আমাদের খাদ্য তালিকায়।
'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না' !

ভারত বন্ধ্

মেঘমুক্ত নীলাকাশে প্রভাতী আলোর আলিম্পন,
আম্রমঞ্জরীর গন্ধেভরা ফাল্গুন।
উশ্রীর ঝিকিমিকি বালুতট—সবে মিলে,
আমাকে আজ যেন উদ্ভাসিত করে দিল।
সূর্যসত্তাকে প্রণাম করে উচ্চারণ করলাম—
'অপাবৃণু',
আমাকে উন্মোচিত করে দাও হে সাবিত্রী।
শ্রীঅরবিন্দের বন্দনাঝঙ্কৃত মন্ত্রে
উদ্বোধন ঘটুক—
আমার ক্ষুদ্রসত্তা মিলিত হোক
আব্রহ্মস্তম্বপ্রসারিত নিখিল সত্তায়।
উচ্চারণে কিংবা আবেগে, উপলব্ধিতে কিংবা উদ্ভাসনে
সত্যিই কোন খাদ ছিল না।
তবু পরক্ষণেই ফিরতে হল কঠিন বাস্তবে,
রাস্তার মিছিলে আর স্লোগানে—
ভারত বন্ধ্, ভারত বন্ধ্। ইনক্লাব, জিন্দাবাদ।
বড়ো বিচিত্র আমাদের এই দেশ!
বিশ শতকের অন্তিম দশকে দাঁড়িয়ে
পঁচাশি কোটি জনতার ভিড়ে রুদ্ধশ্বাস ভারতের আকাশে
সূর্য অবাক, আমাদের আবরণ উন্মোচন করতে দ্বিধাগ্রস্ত বুঝি
আমরা যে আজ প্রাণের ভয়ে মানের দায়ে
স্বার্থতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের হাঁ-তে হাঁ মিলিয়ে বলি—
'বন্ধ করো, বন্ধ কর।'
চোখ কান মুখ খোলা রেখো না—
সব বন্ধ করে দাও।
গড্ডালিকাস্রোতে ভেসে যেতে যেতে,
দু'হাত মুঠো করে ইনকিলাবী সেলাম দিতে দিতে
আমরা সব বন্ধ করে দিলাম আজ।
হে আমার সূর্যসত্তা, হে সাবিত্রী,
আমাদের ক্ষমা করো আজ।

ভাবের ঘুড়ি

ফাগুন শেষের নরম বিকেলে
ভাবের ঘুড়ি ওড়াতে বেশ লাগে।
সকালে ত' গীতা পড়েছিলাম এক অধ্যায়,
প্রজ্ঞাদৃষ্টির আলোয় এক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম
বিশ্বরূপ। ভক্তিতে আর অহমিকায়
দার্শনিক ভাবের ঘুঘু হয়ে জীবনের ভিটেয়
চড়েছিলাম কিয়ৎকাল।
তারপরই শুদ্ধবস্ত্র ত্যাগ করে, প্যান্ট-শার্ট চড়িয়ে
বেরিয়ে পড়েছিলাম গো-দুগ্ধের সন্ধানে ;
গীতামৃত ছেড়ে গোরসসেবন নেহাৎ মন্দ লাগে না।
ঘড়ির কাঁটায় জানান দিল, দশটা বাজে।
অতএব দু'ঘণ্টার চাকুরি করে আসতে
মহাবিদ্যালয়ের শূন্যপ্রায় কক্ষে বক্তৃতা দিয়ে এলাম—
'আমার পৃথিবী তুমি বহুবরষের।'
পৃথিবীর মাটি আমার কিনা
কখনও ভাবতে পারিনি,
কিন্তু আমি যে মাটি হ'তে বসেছি—
সে খবর অবশ্যই রাখি।
তাই, সবার থেকে দূরে বসে—
গজদন্তমিনারবাসী হয়ে নয়, ছাতের কিনারে বসে
জীবনের নরম বিকেলে
আজকাল ঘুড়ি ওড়াতে ভারী ভাল লাগে।
চুপিচুপি জানিয়ে রাখি, আমার জীবনের ঘুড়িও
'ভো কাট্টা'—হ'তে আর বেশি দেরী নেই।